অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার

১। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত। জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রতিবেদনেও 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নির্বাচনের আবিশ্যকতা ঘোষিত হয়েছে।

নব্বইয়ের গণআন্দোলনে জনগণের এই দাবিকে বাস্তবে রূপ দিতে অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ঐ নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য ঐ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ চরিত্র নিশ্চিত করে তিনজোটের ঘোষণায় সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দুই জাতীয় সংসদের অন্তবর্তীকালীন সময় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়। নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য কালো টাকা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিও সেই সময় উত্থাপিত হয়।

ঐ দাবিকে উপেক্ষা করে বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি ভোটারবিহীন একদলীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ ও সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বৈধতা লাভে ব্যর্থ হলে গণ-আন্দোলনের চাপে বার দিনের স্থায়ী ঐ সংসদে সংবিধান সংশোধন করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার-এর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২। দেশব্যাপী তীব্র গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ঐ তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেও সংবিধানের উক্ত সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বল্পকালীন শাসন আমলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করায় নানাবিধ সংকট সমস্যা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া সমূদয় কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করে থাকেন। কিন্তু সংবিধানের ঐ বিধানে রাষ্ট্রপতিকে এমন কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যা সংসদীয় পদ্ধতির মূল চেতনার পরিপন্থি।

এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় দ্বৈত কাঠামো তৈরি হয়েছে যা একান্তরূপে অনভিপ্রেত ও অনাকাংখিত সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। রাষ্ট্রপতির হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যস্ত থাকা এর অন্যতম। অন্যদিকে নির্দলীয় সরকারের রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকার বিধানটিও সংবিধানের পরিপন্থী এবং ঐ সময়কালে রাষ্ট্রপতিকে একক ক্ষমতার অধিকারী করে।

৩। বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতার বিবেচনায় স্বৈরাচারী ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রধান বিচারপতিকে অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করা হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান এবং তিনি না হলে সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রধান বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণ ও দলীয়করণের প্রবণতা সৃষ্টি করেছে।

শুধুমাত্র বিচারকদের চাকুরির বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭তে আকস্মিকভাবে উন্নীত করা তারই সাক্ষ্য প্রদান করছে। এ যাবত বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও তার স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে টালবাহানা, বিচারপতি নিয়োগে দলীয় বিবেচনা বিচার বিভাগ সম্পর্কেও প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। তদুপরি পদাধিকার বলে কাউকে কোন নিযুক্তি প্রদান অনেক সময় যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। এই ব্যবস্থাকে আরও উপযুক্ত, দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রটি কেবল মাত্র বিচার বিভাগের পরিমন্ডল থেকে বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

৪। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা ও অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসাবে সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং ঐ প্রয়োজন ব্যতীত কোনভাবেই কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা।

কিন্তু ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেবল নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে নাই, তারা তাদের আইনগত ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৫। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত কোন সংগঠনের সদস্য হবেন না। সর্বোপরি প্রধান উপদেষ্টাকে সকল রাজনৈতিক দলের আস্থাভাজন হতে হবে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবিধানিক ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সংবিধানের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে জনগণের আকাংখা অনুযায়ী কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনগণের সেই দাবি অনুযায়ী-

(১) রাষ্ট্রপতি সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যদের নিয়োগ দান করবেন।

(২) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে বিবেচনায় রেখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধানকালীন সময়েও রাষ্ট্রপতি সকল বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(৩) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেয়াদকালীন সময় প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্ত হবে এবং তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

এবং

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যপরিধি সংবিধান অনুসারে কেবলমাত্র সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদানের মধ্যে সীমিত থাকবে।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার

একটি স্বাধীন ও কার্যকর নির্বাচন কমিশনই অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। সেই লক্ষ্যে ৯০-এর তিনজোটের ঘোষণায় নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য সেই ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছিল।

নির্বাচনী আইন ও বিধির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ, নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হয় নাই। ফলে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশন নির্বাহী বিভাগের কাছে অসহায় থাকে। এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করতে-

১. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। কতজন নির্বাচন কমিশনার হবেন তাও নির্ধারিত করতে হবে।

২. কমিশনার সাধারণ নিয়মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই কাজ করবে, তবে একাধিক মতামতের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।

৩. নির্বাচন কমিশন একটি স্থায়ী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বিধায় এর প্রতি তদ্রুপ মান্যতা ও মর্যাদা থাকতে হবে যাতে করে নির্বাচন তত্ত্বাবধান, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে নির্বাচন কমিশন কাজ করতে পারে।

৪. নির্বাচন কমিশনের একটি স্বাধীন সচিবালয় থাকবে। নির্বাচন কমিশনের সচিবালয় হবে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সম্পূর্ন স্বাধীন সংস্থা। নির্বাচন কমিশনই উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তার সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করবে এবং তার কর্মচারী-কর্মকর্তা নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করবে। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনকে তার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল সরকার সরবরাহ করবে।

৫. নির্বাচন কমিশন আর্থিকভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীন হবে এবং এ জন্য বাজেটে সংযুক্ত তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়ের বিধান অনুযায়ী সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করা হবে। ঐ অর্থ ছাড় করার ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

৬. নির্বাচন কমিশন রির্টানিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও নির্বাচনের নিরাপত্তার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন থাকবে এবং এ ব্যাপারে সরকার তার অনুরোধ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবে।

৭. নির্বাচন পরিচালনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনের আগে ও পরে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে নির্বাচন কমিশনের অধীন থাকবে এবং এই সময়কালে তাদের কৃত কোন অপরাধ ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং সরকার তা বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

৮. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ও নির্বাচন বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ন স্বাধীন থাকবে।

৯. নির্বাচনী আইন ও বিধি লংঘনের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা ও বাতিল করতে পারবে এবং ঐ আইন ও বিধি লংঘনকারীদের আটক করার আদেশ ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে। এই জন্য ঐ সময়কালের জন্য নির্বাচন কমিশনকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১০. (ক) ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। ভোটার তালিকায় নাম অন্তভূর্ক্তির জন্য প্রচার মাধ্যমে লাগাতার প্রচার ও ক্রস চেকিং-এর ব্যবস্থাসহ ভোটার তালিকা প্রতিনিয়ত নবায়ন করার স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। কম্পিউটারাইজড ভোটার তালিকা ও ভোটারদের জন্য আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। Electronic ভোটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(খ) পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) প্রবাসীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে সর্বদলীয় পর্যবেক্ষণ দল গঠন করবে। জাতীয় ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের মূল্যায়ন নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে করে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং এই পর্যবেক্ষকদের তালিকা নির্বাচন তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সরবরাহ করতে হবে। এ সকল পর্যবেক্ষক কোনক্রমেই ভোট কক্ষ বা বুথে যাবেন না।

১২. আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের বিষয়ও ন্যূনতম পক্ষে ভোট গ্রহণের একমাস আগে প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের কার্যপরিধিও নির্দিষ্ট থাকবে।

১৩. ভোট গ্রহণের জন্য প্রতি বুথে স্বচ্ছ (Transparent) ভোট বাক্সের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার নাম্বারিং থাকতে হবে।

১৪. ভোটকেন্দ্রে সকলের উপস্থিতিতে নির্বাচনী ভোট গণনা ও ফলাফলের স্বাক্ষরিত কপি প্রার্থী বা তার মনোনীত প্রার্থী এবং নির্ধারিত পর্যবেক্ষকদের প্রদান করবে। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের ফলাফলের কনসলিডেটেড বিবরণী নির্বাচন কমিশনকে প্রেরণ করবেন এবং কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১৫. নির্বাচনী ফলাফল বিরোধের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে কোন মামলা দায়ের করা হলে দুই মাসের মধ্যে তার নিস্পত্তি করা এবং সে সংক্রান্ত কোন আপীল সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বেঞ্চ কর্তৃক তিন মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে। এ বিষয়েও নির্বাচন কমিশন নিজে পক্ষভূক্ত হয়ে মামলায় নিস্পত্তির ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

নির্বাচনী আইন ও বিধির সংস্কার

১. নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করার জন্য -

ক. প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য যারা যেভাবেই ব্যয় করুন, তা প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে এবং তা কোনক্রমে নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা লংঘন করবে না। প্রতি নির্বাচনী এলাকায় একজন নির্ধারিত কর্মকর্তা এই ব্যয় মনিটর করবেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবেন। এই রিপোর্টের সাথে প্রার্থীর দেয়া নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ মিলিয়ে দেখা হবে।

খ. প্রার্থীর নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের বিবরণ সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করতে উন্মুক্ত দলিল হিসেবে রাখতে হবে এবং প্রচার মাধ্যমকে তা সরবরাহ করতে হবে। যে কোন ভোটার এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানাতে পারবে।

গ. নির্বাচনী কাজে আয়-ব্যয়ের হিসাব এক মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তা করতে না পারলে ঐ নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।

ঘ. নির্বাচনে কমিশনে আয়-ব্যয় ও সম্পদের মিথ্যা তথ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঙ. খেলাপী ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ করা না হলে ঋণ খেলাপী কোন প্রার্থী নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ঋণখেলাপীর জামিনদারও অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২. প্রার্থীদের সম্পদ ও পরিচয় প্রকাশ -

ক. প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আগেই তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ, কোন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার স্বার্থ জড়িত আছে কিনা সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে হবে।

খ. হাইকোর্ট যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে সেই অনুযায়ী প্রার্থীদের শিক্ষাগত, অন্যান্য যোগ্যতা ও কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা সেই তথ্যসহ অন্যান্য তথ্যসমূহ প্রার্থীর মনোনয়ন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

গ. নির্বাচন কমিশন এই সব তথ্য জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা করবে যাতে ভোটাররা প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে অবগত থাকেন।

৩. প্রার্থী হবার যোগ্যতা -

ক. নিজে অথবা পরিবারের কেউ ঋণখেলাপী হলে, কালো টাকার মালিক বলে বিবেচিত হলে,

খ. সরকারী চাকুরী বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।

গ. স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারী যুদ্ধাপরাধী হলে কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য হবে।

ঘ. দলের মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা, দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ এবং মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য অর্থ দ্বারা প্রভাবিত করার ঘটনা কার্যকরভাবে রোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. নির্বাচনকে সন্ত্রাস, পেশী শক্তির প্রভাব ও দুর্বৃত্তমুক্ত করতে -

ক. নির্বাচনে সকল প্রকার বল প্রয়োগ, অস্ত্র বহণ ও প্রদর্শন পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং বল প্রয়োগের ঘটনার কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

খ. নির্দিষ্ট মেয়াদে ফৌজদারী দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

গ. কোন রাজনৈতিক দল কোন সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিককে মনোনয়ন প্রদান করবে না।

৫. নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার -

ক. নির্বাচনে ধর্মের সর্বপ্রকার অপব্যবহার, সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণা ও ভোট চাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গন্য করা হবে। সাম্প্রদায়িক প্রচারণা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. নির্বাচনে সকলের সমসুযোগ দান -

ক. পোস্টার, লিফলেট, বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপন ব্যবহার, মাইক, নির্বাচনী ব্যানার, দেয়াল লিখন, গেইট নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে যে সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আছে তা ব্যতিক্রমহীনভাবে পালন করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তা এই বিষয়ে নিশ্চিত করবেন এবং এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার আইন ও বিধি ভংগ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবেন।

খ. নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় চৎড়লবপঃরড়হ সভার ব্যবস্থা করবে।

গ. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন থেকে সকল দলের কেন্দ্রীয় সমাবেশ, মহাসমাবেশ, র‌্যালী, জনসভার ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ঘ. নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্বাচনী অফিস ব্যতিরেকে কোন নির্বাচনী ক্লাব, ক্যাম্প, নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্র হিসেবে কোন কাঠামো তৈরী করা যাবে না।

ঙ. রেডিও-টিভির সময় সমভাবে বন্টন করা এবং তার খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।

চ. এসব প্রতিটি বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং লংঘনকারীদের প্রার্থীতা বাতিল করতে হবে।

৭. নির্বাচন পরিচালনার স্বচ্ছতা বিধান

(ক) নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত প্রিজাইডিং অফিসার, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের তালিকা নির্বাচনের ১৫(পনের) দিনের পূর্বেই প্রার্থীদের সরবরাহ করতে হবে যাতে এই বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নির্বাচনের পূর্বেই নিষ্পত্তি করা যায়।

(খ) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকাও একই ভাবে ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রকাশ করতে হবে। জনগণকে অবহিত করতে উভয় বিষয়েই স্থানীয়ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. নির্বাচনে আইন-শৃংখলা রক্ষাবাহিনীর ভূমিকা -

ক. নির্বাচনের নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নির্বাচনের সময় আইনশৃংখলা রক্ষাবাহিনী নির্বাচন কমিশনে ন্যস্ত করতে হবে এবং তার পুর্ননিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের থাকবে।

খ. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সংজ্ঞা পরিবর্তন ও তাদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করে এর পূর্বেকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৭২ সালের পি.ও নং-১৫৫-তে বিধি-৮৭ এবং ৮৯এ এর মাধ্যমে যে পরিবর্তন সাধন করেছে তা বাতিল করতে হবে এবং ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও ১৯৯১ সালের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী নির্বাচনকালে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর দায়িত্ব ক্ষমতার যে এখতিয়ার ছিল তা পুর্নবহাল করতে হবে।

৯. রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীন গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করা -

ক. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহকে গণতান্ত্রিক বিধি বিধানের ভিত্তিতে পরিচালনা, দলের কর্মকর্তাদের নিয়মিত নির্বাচন, দলের আর্থিক বিবৃতি নির্বাচন কমিশনকে প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

খ. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১০. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ -

ক. নির্বাচন আচরণ বিধি যা রয়েছে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে তার জন্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ে সর্বদলীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করতে হবে।

১১. সংরক্ষিত মহিলা আসনে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।